প্রকাশক ঃ নিতাই বল
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৩৬২

মুদ্রাকর ঃ উষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৯সি, বিধান সরণী,
কলকাতা-৭০০০০৬

কবিবন্ধু

নবকান্ত বরুয়াকে

এই কবির আরও কয়খানি কবিতার বই

আরও সূর্যের কাছে — আশা যখন বৃষ্টি

অলক্ষ্যে বিকেল — পদ্মা আমার গঙ্গা আমার

বেলা শেষের গান (যন্ত্রস্থ)

সাঁকো প্রায় পেরিয়ে

পায়ে পায়ে অনেকটা পথ এলেম চলে—
বলা কওয়ার আর কিছু নেই, শুনেছি কম?
কালবোশেখী বন্যা প্লাবন সব পেরিয়ে,
অনেক ছায়া অনেক মায়ার ঘোর কাটিয়ে,
ঋণের পরে ঋণের সাথে সুদ বাড়িয়ে
দিনের পরে দিন কেটেছে দুঃখে ব্যথায়।
একা একা এখন কেবল চিন্তা আমার—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কোথায় বা শেষ?

পথে পথে লক্ষ পথিক এই পৃথিবীর
মানবতীর্থে অহরহই যাত্রী মিছিল;
পুরণো যায় নতুন আসে, একই ধারা—
রাতের পরে দিনের সূর্য যেমনি হাসে।
বিরামবিহীন চলার নেশায় হয় না মনে—
যেতেই হবে, যেতেই হবে, যেতেই হবে!
হঠাৎ এখন নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখি—
এ সার্কাসের শুরু কোথায়, কবেই বা শেষ?

মনের কথা থাকুক মনে, বলবো কাকে?
কেইবা শোনে, নিজের কাজে ব্যস্ত সবাই।
দৌড়ে এখন চলছে জগৎ বহুৎ জোরে,
জয়ের পরে জয় মানুষের নিত্য নতুন।
পেন্ডুলামের মতোই চিন্তা দোদুল্যমান—
তার পরে কি, তার পরে কি, তার পরে কি?
রাত্রি শেষের হিমেল হাওয়ায় ভাবছি জেগে—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কোথায় বা শেষ?

এখন আমি ভিড়ের থেকে অনেক দূরে,
কোলাহলের কলরবের নেই ঝামেলা।
সবই যেন তুচ্ছ লাগে আমার কাছে,
আকাশ থেকে যেমন দেখায় এই ধরণী।
হিসেব-নিকেশ শেষ করেছি বেশ কিছু কাল;
মুশকিল আসান হবার পরে কী আর থাকে?
ভাবছি জেগে রাত্রি শেষের হিমেল হাওয়ায়—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কবেই বা শেষ?

আজ আছি, কাল হয়তো বা নেই, এই তো জানি,
বালির ওপর ঘর বেঁধেছি কার কিবা দোষ?
যে বীজ বপন তেমনি ফসল হতেই হবে,
যেই ব্রত তার তেমনি কথা অন্যথা নেই।
কৃত্রিমতায় জর্জরিত ভালোবাসার প্রতিকৃতি,
সবটুকুতেই অনিশ্চয়ের কাঁচের বেড়া।
তাইতো ভাবি ঠান্ডা হাওয়ায় রাত্রি জেগে—
এ সার্কাসের কোথায় শুরু, কবেই বা শেষ?

উদ্যানে আর ফুল ফোটে না, গন্ধ কোথায়?
পাখির কূজন যায় না শোনা, বন্ধ সে-সব
অনেক দিনই। কল্পলোকের কৃষ্ণচূড়ায়
দূর থেকে রোজ নিজকে দেখি, রক্ত ঝরে।
বুকের তলায় শুকনো গোলাপ শেফালিদের
আগুন জ্বলে, আগুন জ্বলে, আগুন জ্বলে!
বিদায় যতই ঘনিয়ে আসে কেবল ভাবি—
এ সার্কাসের শুরু কোথায়, কখন বা শেষ?

জীবনটাতো সাঁকোর মতোই পার হতে হয়,
পারাপারে সতর্কতার খুব প্রয়োজন!
কালের রায়ে সূক্ষ্ম বিচার সুনিশ্চিত,
অভিযোগ ও অনুতাপে নেই কোনো ফল।
অসাবধানীর অনিবার্য অকাল পতন;
তবু কি ছাই আমরা বুঝি কোনটা ভালো,
কিংবা যাচাই করে দেখি মন্দ কিসে?
আসল কথা আমরা সবাই কম আর বেশি
বেপরোয়া। কাল হারিয়ে ভাবছি এখন—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কোথায় বা শেষ!

চাওয়া পাওয়ার নেই পরিশেষ এই জীবনে,
চাওয়ার নেশা পাওয়ার খিদে সেদিন খতম
যেদিন বিদায় এই পৃথিবীর মাটি থেকে,
স্তব্ধ যেদিন সকল লড়াই অবসানে।
প্রতিবাদের ঝড়-তুফানে মাঝে মাঝেই
ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসে চতুর্দিকে,
তার চেয়ে যে প্রীতিবাদের শক্ত বাধন
অনেক ভালো—সে বোধ কেন দেয়না দেখা,
প্রশ্ন জাগে। এখন শুধু এটুকুই জানতে ব্যাকুল—
এ সার্কাসের কখন শুরু, কবেই বা শেষ?

বিক্ষত প্রাণ রিক্ত হৃদয় ভালোই আছি,
এবার আমার শূন্য দু'হাত, শূন্য আশা;
দেবার নেবার নেই কিছু নেই, এই তো সুখের,
অহংকারের সকল গ্লানি যাক ধুয়ে যাক।
অনেক দেখা অনেক শেখা হলেও জানি,
জীবন-জগৎ সমুদ্দুরের সীমানা নেই।
তেমন মহা পণ্ডিতেরও জ্ঞানভাণ্ড কতটুকু?
সাগর সেচে মণি-মুক্তো যায় কুড়নো সব কখনো?
যা পেয়েছি যা জেনেছি তাই বা কি কম!
কী আর হবে হাতড়ে আরো, ভাবনা এখন—
কোথায় শুরু এ সার্কাসের, কখন বা শেষ!

এখন আমি ভগবানের খুবই কাছে—
পাশেই যে তাঁর আমার আসন দেখছি পাতা।
দুই প্রবীণে এবার হবে আলাপ সালাপ,
সুখ দুঃখের নানা কথা ভাব বিনিময়;
অতীত জুড়ে স্মৃতির ভুবন আলো কোথায়?
বিগত দিন বিষণ্ণতার ছায়ায় ভাসে,
অনেক হলো যোগ-বিয়োগের খেলাখেলি,
শূন্য ঝুলি কাধে হাজির সদর ঘাটে;
সব ফুরিয়ে প্রসন্নতায় সত্যি খুশি।
দেখা দেখি লেখা লেখি সব রেখে যাই,
দিনকে ধরে রাখা কি যায় অস্তাচলে?
মুছে যাবার আগে এটুক গেলেম বুঝে,
ভালোবাসা দিলেই মেলে ভালোবাসা।
আর কিছু নেই এ মুহূর্তে চিন্তা করার,
ভাবছি শুধু শেষ প্রহরের হিমেল হাওয়ায়—
এ সার্কাসের কখন শুরু, কোথায় বা শেষ!

তবুও যে চাই

তেমনি পুতুল বাইরে দেখে থমকে দাঁড়াই,
হাত বাড়িয়ে যায় না ধরা অনেক সে দূর।
যা কিছু চাই তাই পাওয়া কি সহজ কথা?
তবুও যে চাই, তবুও যে চাই, তবুও যে চাই!

এলোমেলো অনেক কথাই পাখির মতন
উড়ে বেড়ায় এদিক সেদিক মনের বুকে,
কিন্তু বৃথাই; ঝড়ের ভাষা শেকল-বেড়ি।
তবুও যে চাই, তবুও যে চাই, তবুও যে চাই!

ঝিনুক মনের অস্থিরতায় স্মৃতির দহন,
দিগন্তে মেঘ যখন তখন বৃষ্টিধারা;
সব আয়োজন দেয় ভাসিয়ে বন্যা এসে,
তবুও যে চাই, তবুও যে চাই, তবুও যে চাই!

নিজ খেয়ালেই অন্ধকারে শিউলি ঝরে;
অবুঝ ভালোবাসার নেশায় মগ্ন থেকে,
সন্ধ্যেবেলায় ধূসর মরু নির্জনতায়—
কেবল খোঁজা আলো কোথায়, আলো কোথায়,
আলো কোথায়!

এখন সত্তায় বাঁচি

অনাদিকালের প্রথা নকলনবিশী,
আবির্ভাব অবস্থান আর তিরোধান!
বিশ্ব জুড়ে পরানুকরণ।
অন্ধকার সৃষ্টি আমাদেরই,
প্রয়োজনে প্রদীপ জ্বালাই।
স্বপ্নেরা সহস্র চোখে আমাদের দেখে,
ঘটে তাই অস্তিত্বের বিস্তৃতি সহজে।
রাত্রির শরীরে হাত দিলেই চমক,
সুনিবিড় আত্মীয়তা এখন কোথায়?
সর্বত্রই অতি দীন ভিখারী মানুষ,
আশার টুকরোগুলি সীসের ওজন।
তবু চেষ্টা, বিষণ্নতামাখা ক্রান্তিকালে
ধর্মনাশা কর্মনাশা গণ-টোকাটুকি!
কলকাতা নৈরাশ্যে কাঁদে বড়ই দুর্দিন,
প্রকল্পের গল্পে গল্পে বিমূঢ় যৌবন!
এখন পাহারা নেই নীতিবোধ শেষ,
জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবল সত্তায়
কোনোক্রমে বেঁচে থাকা নিঃশর্ত সঙ্কোচে।
উভয় গোলার্ধব্যাপী শুধু গোলাগুলী—
নির্ভরতা নেই কিছু হতভম্ব ব্যথা,
তবু আমি দিগ্বিজয়ী সম্ভাব্য সংগ্রামে!

দর্পণে মুখ

দর্পণে যেই মুখের ছায়া হাজার স্মৃতি;
অতীত মুখর, মৌনী আমি অবাক লাগে।
হারাণো দিন হারাণো মন যায়না পাওয়া,
তবুও ভাবা, তবুও ভাবা, তবুও ভাবা!

সুখের নেশায় আসল-নকল বিচার ছেড়ে
সময়টুকু কাটিয়ে দিয়ে যখন ফকির,
শুধু শুধুই চিন্তা তখন, কি লাভ তাতে?
চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি!

জমা-খরচ হিসেব নিকেশ অনেকদিনের,
আর কি হবে জের টেনে তার ভূতের বেগার;
থাক বাড়িঘর আর যা কিছু মিথ্যে বোঝা,
বৃথাই টানা, বৃথাই টানা, বৃথাই টানা!

অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবেই আছি,
বড়াই তবু জগৎটাকে পুরোই জানি;
জানাজানি টানাটানির মেয়াদ ফুরোলো,
যেতেই হবে, যেতেই হবে, যেতেই হবে!

ওপার থেকে এপার এসে সওদা সারা,
কালের নৌকো চলছে বেগে আপন ভাবে,
ছিলেম কোথায় এলেম কোথায় এখন ভাবি—
কোথায় যাবো, কোথায় যাবো, কোথায় যাবো!

আসন্ন শতাব্দীর বন্দনায়

সংগ্রামের পর সংগ্রাম চালিয়ে চালিয়ে ক্লান্ত,
প্রায় জরাগ্রস্ত স্থবির এই বিংশ শতাব্দী।
আসন্ন বিলুপ্তির আগে দর্প করে আরেকবার
হয়তো সে জ্বলে উঠবে শেষবারের মতো।
জ্বলে উঠবে আবর্জনা-পঙ্কিলতামুক্ত নতুন বিশ্বে
নতুন শতাব্দীর অভ্যুদয়কে স্বাগত-জানাতে।
স্থির বিশ্বাসের পাহাড় পর্বতে
কতো হাসির ফোয়ারা তখন ছড়িয়ে পড়বে আকাশে।
আমি আমার সমস্ত স্বপ্নকে তখন গভীর ভরসায়
নতুন পৃথিবীর সদর দরজায় জমা রেখে যাবো,
যাতে শান্তি ও সাম্যের সুষমায়
মানুষের এই বিকৃতি-মুক্ত নতুন জগত
অনন্ত অমৃতময় আনন্দের স্বর্গ হয়ে ওঠে।

একটু আগেই পোস্টম্যান এক জরুরী চিঠি দিয়ে গেল;
সেই চিঠিতেই জানলাম, স্পষ্টভাবেই জানলাম,
আসন্ন একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই
এক সমুজ্জল নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটছে।

একটি গানের জন্ম

জেগে উঠেই দেখি মশারির ভেতর দিয়ে
হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভোরের নতুন সূর্য।
গায়ে হাত বুলোতে বুলোতেই সে আমায়
সাগ্রহে জড়িয়ে ধরেছে মুহূর্তের মধ্যে।

সেই আনন্দেই একটি গানের জন্ম হলো
আমার অবারিত কণ্ঠের সদর রঙমহলে।
আমি মাটির বন্দনায় সহসা মেতে উঠলাম
এবং ঠিক সে সময়েই আমার মনে হলো,
আমি মৃত্যুর সব লক্ষণকে অস্বীকার করে
চলতে পারি এবং অপজন্মকেও এড়াতে পারি।

তবু ক্ষণে ক্ষণেই আমার হৃদয়ের রাজ্য জুড়ে
আমি বাইরের জগতের একটা ভূমিকম্পের
স্পন্দন অনুভব করে বার বার চমকে উঠছি।
আমার মনে হলো, এই বিশাল বিশ্বে আমিও
একখণ্ড মাটির ওপর যেন গাছ হয়ে জন্মেছি;
আর সেই গাছের ভেতর সঞ্চিত একটি বীজ
আজকের কড়া সূর্যালোকের আলিঙ্গনে
পৃথিবীকে উপহার দিলে এক অভাবিত গান ;
যে গান সাম্যের মৈত্রীর ও ভালোবাসার গান,
যে গান মৃত্যুকে মানে না, প্রকৃতই জীবনসংগীত।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে

সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে
আমি অন্ধকারের রাজ্য থেকে বেরিয়ে এলাম।
সূর্যের আলোয় পেঁচক আততায়ীরা সব পলাতক;
অহেতুক জরিমানা গুণতে গুণতে আমি প্রায় ফতুর।
তাই সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে চুমু খেতে খেতেই
অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।
আলোর জগতে এসেই বেশ অনুভব করতে পারছি,
মস্ত একটা আশার গাছের শেকড় ক্রমশই যেন
আমার বুক জুড়ে সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।
এই আশার গাছের শীতল ছায়ায় এবং তার শব্দের
সুরভির মধ্যে আমি আরো আনন্দে বেঁচে থাকতে চাই।
ভালোবাসার রাজসূয় যজ্ঞে যখন আমি মেতে আছি
সে সময় আমায় যেন আর জরিমানা দিতে না হয়।

দিনের আলোয় পেঁচক আততায়ীরা এখন পলাতক,
কড়া চোখে ঐ পেঁচকদের দূরে সরিয়ে রাখতেই হবে
আর যারা মানুষের হাড় চুষে চুষে খায় তাদেরও।
সৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্য থেকে, শূন্য ও অরণ্য থেকে
বিন্দু বিন্দু বিশুদ্ধ আক্সিজেন কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে,
আরো অনেককাল আমি বাঁচতে চাই বলেই তো
সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতেই
অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলাম!
তারপর ক্ষিপ্র পদক্ষেপে এই সুন্দর সমুজ্জ্বল
আলোর রাজ্যে এসে আমি সবার সাথে সামিল হলাম!

পিছনে তাকিয়ে

আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই,
দেখি ছায়ারা দিব্যি হেঁটে আসছে
আমায় অনুসরণ করে। দুঃখগুলি
সময় সময় যখন প্রতিধ্বনি হয়,
আমি একটা তাড়না অনুভব করি।
বিদ্যুৎ সঙ্কটে গ্রীষ্মের দারুণ গঞ্জনা,
তারই মধ্যে অকস্মাৎ স্বপ্নের জগতে
কোলাহল শুরু করে স্মৃতির প্রতিমা;
মুহূর্তেই মুখরিত সুদূর অতীত।

আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই,
ছায়াদের পদক্ষেপ স্পষ্ট কানে আসে—
যেন কোনো রেলগাড়ি সমুখে এগোয়
ঘটনার ভিড় বয়ে বহু বগি নিয়ে।
কাছে তায় টেনে নিয়ে বক্ষের উত্তাপে
সুপ্তিমগ্ন নিঃশ্বাসের অস্থির বাতাসে।

গাছগুলি যখন বৃদ্ধ হয়

বড়ো বড়ো গাছগুলির চেষ্টার কথাই শুধু বলছি না,
মানুষও যুগ যুগ ধরে অসংখ্য ছড়ায় আর কবিতায়
চাঁদের সাথে প্রাণভরে মিতালি করতে চেয়েছে,
কল্পনার হাওয়াই গাড়িতে সেরাজ্যে ঘুরেও এসেছে।
এতকাল পরে সে আশাতো পূর্ণ হলো। তারপর?
তারপর আরো কত শখের ঘুড়ি উড়বে আকাশে!
কালের স্রোত বয়ে চলবে ঠিক এমনি করেই, এবং
আশার হ্যারিকেনটা ক্রমাগত জ্বলতেই থাকবে।
এ যুগে টেপরেকর্ডারে কত শত কথাই না বন্দী!
ভবিষ্যতের মানুষ তা থেকে ও অসংখ্য বইপত্র থেকে
এবং রূপকথা উপকথার কাহিনী থেকেই বুঝতে পারবে,
তাদের পূর্বপুরুষরাও এক সময়ে ঠিক তাদেরই মতো
কেবলি আশার রঙ্গীন ঘুড়ি উড়িয়েই খুশি থাকতেন।

সময়ে ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বৃদ্ধ হয়ে যায়, যাবেই---
তবে শুকনো শিকড় থেকেই আবার নবপত্র দেখা দেয়।
সবাই বিদায় নেয় সুনিশ্চিত সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে,
তাদের পিপাসাগুলি কুঁড়ি মেলে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারে ;
হাসির জোয়ার নামে সে মুহূর্তে মানুষের কর্কশ জগতে।

কাঁদতে ইচ্ছে করছে

কোমল মাটিতেই বীজ পুঁতেছিলাম,
একটি সুন্দর চারা মাথা তুলেছিল।
রক্ত গোলাপের অনেকগুলি কুঁড়িই
আমরা ধরিয়েছিলাম আমাদের ঐ
শক্ত সতেজ নতুন গোলাপ চারাটিতে।
সে চারায় দু'টিই ডাল—দুই বাঙলা;
দু'টি ডালে ক'টি করে কুঁড়ি ফুটিফুটি।
চারদিকে গৌরব হাসি ছড়িয়ে দিয়ে
একে একে ফুলেরা ফুটবে—কত আশা!
কিন্তু নিরাশার ছায়া দেখছি সেখানে,
কুঁড়িগুলি ক্রমশই যেন শুকিয়ে যাচ্ছে!
এ দৃশ্যে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।
প্রীতির পাপড়িগুলি সতেজ করতে
আরো অনেক রক্তাঞ্জলি চাই বুঝি!

আছে সুখ আছে শান্তি

দুঃখেরে উপেক্ষা করে মূর্ত সুখ উথাল পাথাল
বাতাসের নগ্ন নৃত্যে বেসামাল বৃক্ষের সমাজ
উতলা নদীর ঢেউ সুর জাগে কোমল গান্ধার
জেগে থেকে সারা রাত সবই দেখে শহীদ মিনার
জলের সামনে এসে ডুবে যেতে বড়ো ইচ্ছে হয়
মাছেদের মতো করে ডুবে ডুবে ভেসে ভেসে প্রেম
শাপলারা হেসে হেসে দীঘি-বুকে যে কাহিনী কয়
কিন্তু শখ সর্বদাই বাধা পায় মোহনার মুখে
বিবাগী বিকেল আনে নিত্য ঝড় রক্তের স্বভাবে
যেখানে অস্তিত্বে লাভ স্পর্শ সুখ অন্তিম স্বর্গের
মিথ্যার কুহক কিংবা অন্যকথা যে যাই বলুক
পৃথিবীতে আছে সুখ আছে শান্তি অনেক প্রত্যাশা
সে লোভেই বেঁচে থাকা আকাঙ্খায় দিয়ে দাসখত
কিন্তু আনে অনেক ঝামেলা দূরবর্তী অসুস্থ ঈশ্বর
সন্ত্রাস-ভর্তি ট্রাক নগরীর বুকে ছুটোছুটি
অন্তরায় নেই কোনো আলিঙ্গনে নিস্তব্ধ নিশীথে
বাসনার বাসা সব দেহ আর মনের কন্দর
নিরাময় হতে হলে রোদ চাই-ই ঝলক ঝলক।

চোখের মধ্যে

বিস্ময়ের শেষ নেই সীমানা নেই চোখের ;
চোখের মধ্যেই ভয়, চোখেই ভালবাসা।
সুখদুঃখের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে
আনন্দ-বেদনার বন্যা-প্লাবনের তরঙ্গও
খেলে যায় দু' চোখের গঙ্গা-যমুনায়।
হাস্যরসের ফোয়ারা হয়ে ওঠে কখনো,
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মহড়াও চলে সেখানে;
বিস্ময়ের শেষ নেই সীমাও নেই চোখের।
ক্রোধে প্রতিহিংসায় উন্মত্ততার ছায়াপাত
যেমন ঘটে পাশাপাশি দু'টি চোখের দর্পণে,
বিশ্বাসঘাতকতার ক্রূর দৃষ্টিও সেখানে স্পষ্ট।
চোখের মধ্যে প্রেমোচ্ছ্বাস, চোখেই প্রার্থনা;
চোখের মধ্যেই তো স্বপ্নের মায়াকাজল,
হৃদয়ের অভিব্যক্তি সুদুর্লভ আত্মনিবেদন।
চোখই জাগিয়ে রাখে, চোখেই সতর্কতা,
সেই চোখই ধরিয়ে দেয় অপরাধীদের।
চোখেই যত জ্বালা, চোখের দেখায়ই তৃপ্তি,
এখানেই জীবন এখানেই মৃত্যুরও আসন।
বিস্ময়ের শেষ নেই সীমানা নেই চোখের ;
চোখের মধ্যেই ভয়, চোখেই ভালোবাসা।

জলপড়ার শব্দে

এক এক দিন হৃদয় জুড়ে কেবলি জলপড়ার শব্দ শুনি
সেই শব্দের ঝংকার জলতরংগের বাজনার মতো শোনায়
নির্বাসন যন্ত্রণার মধ্যেও একটা নতুন সুরের সন্ধান পাই যেন
অনাস্বাদিত এক শান্তি ও সান্ত্বনার গাঢ় আকর্ষণ সেখানে
সে আকর্ষণ ধীরে ধীরে আমায় এমন এক জগতে টেনে নিয়ে যায়
যেখানে শুধুই সুধা প্রস্রবন আর প্রতিটি মুখে তৃপ্তির আনন্দ-ছায়া।

স্বপ্নের জানালার ধারে বসে আমি যখন নিরালায় থাকি
তখন তন্ময় হয়ে গিয়ে হৃদয়ে কেবলি জলপড়ার শব্দ শুনি
কান পেতে থাকলে শব্দগুলিকে মন্ত্রের মতোই মনে হয়
সেই শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কে যেন হাত বাড়িয়ে ডাকে আমায়
ইচ্ছে করে তার একখানা পোর্ট্রেট এঁকে ফেলি তাড়াতাড়ি
তখুনি তখুনি স্বপ্নের জানালায় একান্ত সাধনায় বসে পড়ে
কবিতার সুরম্য শরীরে একখানি রঙিন চিত্রকলা গড়ে তুলি
ছবি আঁকার সাফল্যে আমি নির্বাসন যন্ত্রণাও ভুলে যাই
হৃদয় রাজ্যে যখন কেবলি এই জলপড়ার শব্দ শুনতে হয়
কবিতার শরীরে তখন এমনি করেই মূর্তিরা সব জন্ম নেয়।

আলোর ঝর্ণায়

মধ্যরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে শৃঙ্খলছেঁড়া পাখি
হঠাৎ আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়লো।
ওদের মুখে মুখে নবযুগের আগমনী
এবং নবজাতকের বন্দনাগান।
মুহূর্তগুলো মুখর হয়ে উঠলো
অবিরাম জয়ধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে।
সর্বস্ব পণের ঐ বিজয় রাত্রিতে
আলোর ঝর্ণায় স্নান করছিল সারাদেশ
পরম আনন্দে যুগান্তের বিক্ষত চিত্তে
গভীর প্রত্যাশার স্বপ্নকে সাথী করে।

পথে পথে জনসমুদ্রের কলকল্লোল,
মুক্তির উল্লাসে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ।
পত্ পত্ করে পতাকা উড়ছিল,
তেরঙ্গা পতাকার ভাষায় কী অমৃত যাদু!
সে আমাদের সম্মিলিত জীবনের প্রতীক,
আমাদের শান্তির প্রত্যয়ের ও সমৃদ্ধির।
অন্ধকারের অর্গল যখন ভাঙতে পেরেছি
তখন কোনো বাধাই আর মানবো না:
সূর্যটাকে পাহারা রেখে গোটা বিশ্বকেই
আমরা আলোর জগতে নিয়ে যাবো।

মধ্যরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে শৃঙ্খলছেঁড়া পাখি
হঠাৎ আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়লো।
সেই অপূর্ব দৃশ্য বছরের পর বছর ধরে
আমার মনের আকাশকে ছেয়ে রাখছে।
দগদগে সেই পুরনো কাটা ঘায়ের দাগটাও
ক্রমশই ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে।

সমুদ্রের অস্থিতে ঝড়

অরণ্য অজাতশত্রু স্থিরদৃষ্টি চোখ ঃ
প্রচণ্ড শক্তির বেগ সমুদ্র অস্থিতে,
সম্ভবত কোনো অভিযান
বঞ্চনা শোষণ থেকে বাঁচার দাবীতে;
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে
রোষের আগুনে দগ্ধ
সমুদ্রের শরীরের শিরাগুলি
প্রতিবাদে বার বার ফুঁসে ফুঁসে ওঠে।

দৃষ্টিতে বিস্ময় মেখে শঙ্খচিল দেখে ঃ
সমুদ্রের হাড়ে হাড়ে কী ভীষণ ক্ষোভ!
তীরে তীরে পাহাড়ে প্রান্তরে
কেবলি মৃতের স্তূপ অশরীরী ছায়া;
তবুও আশ্চর্য লাগে কোথাও কখনো
মৃত্যুরে পরোয়া নেই।
অনুক্ষণ অশ্বারূঢ় তরঙ্গ মিছিল।
কারণ অজ্ঞাত নয়;
তাদের মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সমুদ্রের হৃদপিণ্ডে মুক্তির নিশান,
স্বাধীন সত্তায় চিত্ত স্থির প্রতিশ্রুতি।
আত্মার বিজয় গান পাখা মেলে যায়,
আর তার দেহ দোলে গর্বের হাওয়ায়।

জেগে উঠে...

মুছে যেতে রাতের আঁধার
জেগে উঠি সূর্যের চুমুয় ;
নিরপেক্ষ সময়ের সাথে কিছুক্ষণ
বসার সুযোগ পাই, আলোচনা হয়।
চিন্তার নৌকো ছাড়ি পাল তুলে দিয়ে,
বেশ লাগে শান্ত মন-মধুমতী নদী।
অতীতের পটে বর্তমান, তার সাথে
ভবিষ্যতও আলোচ্য বিষয়।

কখনো মাতাল হই হঠাৎ হঠাৎ
গুন্ গুন্ সংগীতের সুরের সুরায়,
কখনো বা নুয়ে পড়ি আকণ্ঠ বিলাপে
ক্রীতদাসী জীবনের ঘন বেদনায়।
ছলনার পাশা খেলা চলে পূর্বাপর
শেষরক্ষা স্বপ্ন দুরাশায়,
ব্যর্থ রাজা দর্পী দুর্যোধন
ডুবেছেন স্বখাত সলিলে।

এ যুগেও ইতিহাসে একটি অধ্যায়
সহসা বিদায় নেয় রক্তে হাত ধুয়ে।
সমস্ত চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করে
পৃথিবীর মানচিত্রে ঘটে অকস্মাৎ
নবীন স্বাধীন এক রাষ্ট্র অভ্যুদয় ;
পূর্বাশায় ঝাঁকে ঝাঁকে শান্তির কপোত।

অরণ্যে অরণ্যে করতালি

এই অপরাহ্নে অরণ্যে অরণ্যে
কেবলি যেন করতালি শুনছি।
আসন্ন বিজয়ের উচ্ছ্বাসেরই
এই উন্মুখ মুখরতা।
ওদের রণসঙ্গীতে তাই আর
জোর নেই, ভাটা পড়েছে।
পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যে
সবাই এক একজন দধিচী,
তাদের অস্থি-অস্ত্রে প্রান্তে প্রান্তে
পর্যুদস্ত হবেই দস্যুরা।
আমাদের পবিত্র অঙ্গীকারের
ঝঙ্কারেই ওরা সন্ত্রস্ত।
মানুষের শ্রেষ্ঠ অহংকার স্বাধীনতা,
সে আহ্বানকে কে রুখবে?
প্রচণ্ড একটা ঝড়ে দস্যু দুর্গগুলি
একে একে সব ভূমিসাৎ;
নরদেবদের হৃত স্বর্গ উদ্ধারে
এই বিশ্বের মুক্তি অনিবার্য।
এই অপরাহ্নে অরণ্যে অরণ্যে
তাই শুধু করতালিই শুনছি।

অন্ধকার যখন আততায়ী

গোলাপের গন্ধও কেড়ে নেওয়া যায়,
আকাশের তারাও মাঝে মাঝে খসে পড়ে,
আলোকে তো প্রত্যহই গ্রাস করে অন্ধকার।
সব জীবনেই অন্ধকার একদিন নেমে আসে,
নির্বিচারে সব আলোই সে নিভিয়ে দেয়।
কিন্তু যেখানে সে প্রত্যক্ষ হত্যাকারী,
সেখানেই বিশেষভাবে চিরচিহ্নিত সে।
যেমনি সে মহামানব যীশুর আততায়ী,
তেমনি সক্রেটিসের ও লিংকনের
এবং মহাত্মা গান্ধীর।
এমনি আরো অনেক বিরাট ব্যক্তিত্বের
আততায়ী অন্ধকার।

যুগে যুগে যারা সত্যের গান গায়,
অহরহ ভালোবাসার গান শোনায়,
এবং বিপ্লবের শ্লোগান দেয় প্রয়োজনে,
সেই কবিদের আত্মার আলো উপড়ে নিতে
তৎপরতার অন্ত নেই অন্ধকারের।
স্পেনের মহান কবি লোরকার খুনে
এই ধরিত্রীকে তাই সিক্ত হতে দেখি,
তেমনি করেই আরব কবি আবুল আলা
এবং প্যালেস্টাইনের কামাল নাসেরকে
ঘোর অন্ধকারের বলি হতে হয়।

মনুষ্যত্বের ও মানব স্বাধীনতার
আরেক গায়ক চিলির ত্রাতা-কবি
ও লাতিন আমেরিকার গৌরব-সূর্য
পাবলো নেরুদাকেও তেমনি করেই
কণ্ঠরোধ করে দেয় আততায়ী অন্ধকার!
এমনি হাজার হাজার কবি-দার্শনিক
ও মানব-প্রেমিকের প্রাণ-হননই
অন্ধকারের নিরুদ্বেগ আনন্দ-লক্ষ্য!

কি যে হলো

ছেড়ে আসা গ্রামের মানুষ নগরবাসী,
মায়ের কাছে চায় যেতে মন ছন্নছাড়া;
জেগে উঠেই পুরনো সেই ভাবনা কেবল—
কি যে হলো, কি যে হলো, কি যে হলো!

কী আদরেই কাল কেটেছে শিশুবেলায়,
বাল্যে এবং কৈশোরেতে কতই সোহাগ ;
সব হারানোর নেশায় মাতাল যৌবনেতে—
কি যে হলো, কি যে হলো, কি যে হলো!

মাঝে মাঝেই বজ্র যেন ডাকছে শুনি,
সেই যোগিণী আমার গাঁয়ের সিদ্ধা নারী ;
হৃদয় কাঁদে সেই মা-মাটির কোলে যেতে—
কি যে হলো, কি যে হলো, কি যে হলো!

দিন যত যায় জোর পিপাসা কেবল বাড়ে,
আশায় আশায় আয়ু ফুরোয় তবুও ভাবি—
মায়ের কাছে ফিরে যাবোই, যাবোই যাবো;
কি যে হলো, কি যে হলো, কি যে হলো!

অন্ধকার পাথরের মতো

সপ্তাশ্বের বল্গা টেনে টেনে দৈনিক নাটকে
ক্লান্ত রোদ স্বাভাবিক সন্ধ্যার আকাশে।
নিরুত্তাপ সূর্যকণ্ঠ ছড়ায় রক্তাক্ত ছায়া
দিগন্তের নীলাচল জুড়ে ধূসর ব্যথার।
অনেক মনীষী-বাণী, তাত্ত্বিকের খণ্ড খণ্ড কথা
শরীরী সাক্ষাৎকারে ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়ায় সমুখে।
চারিদিকে বিজ্ঞতার ভান রাত্রিকে প্রশ্রয় দেয়,
ঘন শক্ত পাথরের পাহাড়ের মতো অন্ধকার।
তাকে ধুয়ে মুছে ফেলা কতটা সম্ভব
শুধুমাত্র বক্তৃতার অবিরাম শিলাবৃষ্টি দিয়ে?
সে প্রশ্নেরই আনাগোনা পথে-প্রান্তে কলে ও কলেজে,
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরাতো নিপাত ভূতলে, কে দেবে উত্তর?
সহসা বোমার শব্দ, ট্রাম-বাস জ্বলে জ্বলে ছাই—
এ দুর্বোধ্য শাসানিতে অন্ধকার আরও পাথর!
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট পুকুরের বুকের ওপর
জলের আড়াল থেকে মাছেদের ভয়ার্ত বুদ্বুদ।

জীবন যেমন

নির্দিষ্ট আশ্রয় নয়, বহতা এ নদী
সারি সারি আকর্ষণ দুই তীর জুড়ে,
চাঁদের তারার স্বপ্ন পাহাড় চূড়ায়
এলোমেলো মেঘেদের বেশ জমে মেলা
ঝুলন্ত শূন্যের বুকে শিখরে শিখরে
যতদিন এই দেহে উজানী গুঞ্জন,
তারপর ক্রমে ক্রমে গোধূলি বিকেল;
উদ্যানে সন্ধ্যায় ঝরে স্মৃতির কুসুম
নানা-রঙ নানা-গন্ধ হাসি ও কান্নার।

উজানে ভাটায় আর আলোয় আঁধারে
এমনিই মনে হয় প্রতিটি জীবন
মূর্তি হয়ে গড়ে ওঠে ঈশ্বরের মতো;
ঈশ্বরও যেমন দৃশ্য করুণা ধারায়,
অন্ধকারে অধিকাংশ কাল উদ্‌যাপন,
সুখে-দুঃখে মানুষের জীবনও তেমনি
বহতা নদীরই মতো লক্ষ্যপথে ধায়।
সব শেষে একদিন সমস্ত পায়ের শব্দ
শুয়ে পড়ে অতীতের নিটোল শয্যায়,
জীবনেও যেন ঘটে বহমান ঋতু আবর্তন।
নির্দিষ্ট সরাই নয়, ঠিক এক বহতা এ নদী-
কোথা তার তরঙ্গেরা সমুদ্রে মিলায়,
তীরে তীরে রেখে যায় হৃদয় স্বাক্ষর।

আমি এক যাদুঘর

স্মৃতির কুয়াশার আড়াল থেকে আজ যা কিছু দেখি
সবই ঝাপসা। এখন যে অন্য দিন। অন্ধকার যখন
আলো হয়ে ওঠে, প্রজাপতির ডানায় তখন উড়ন্ত মন।
এও ঠিক, সুখের যন্ত্রণা যখন অসহ্য, ব্যথায় আনন্দ পেতে
মন তখন ব্যাকুল। নীলিমার নীল স্বপ্নদের মধুক্ষরা
হাসিগুলি ইচ্ছের এক এক ঝাঁক প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।
ভালোবাসার গান গেয়ে গেয়ে যায় শৌখীন ভ্রমরের দল
গোলাপের কানে কানে। কোথাও যে একটু হারিয়ে যাবো,
এই পৃথিবীতে তেমন জায়গাও নেই! ভাবতেও যেন একটা
চাপা অস্বস্তি বোধ। আমি যেন আজ পুরনো এক যাদুঘর।
অসংখ্য মৃত আকাঙ্ক্ষা সেখানে কত যত্নেই না সংরক্ষিত!
বিরাট সে সংগ্রহশালা আর কারো চোখে পড়ুক বা না পড়ুক,
আমি এবং এককভাবে আমিই তার সর্বক্ষণের নীরব দর্শক।
এই আমার আত্মদর্শন। তবে স্মৃতির কুয়াশার আড়াল থেকে
আজ যা কিছু দেখি সবই যেন কেমন ঝাপসা। আপাতত
আমরা সকলে একই সঙ্গে নরক স্টেশনের দিকে ট্রেনযাত্রী!

বৈশাখী মন

সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস,
ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হয়ে শুরু হবে নতুন জীবন;
পশ্চাতের রক্তমাখা দিন-মাস-বছরের সমস্ত সন্ত্রাস
স্মৃতি থেকে মুছে যাবে; শুচিস্নিগ্ধ শুভ্র আলিম্পন
ঘরে ঘরে আঁকা হবে, সুখ-স্বপ্নে আশা ও আশ্বাস;
সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস।

সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর,
আগুনে রোদ্দুরে পুড়ে অতীতের পাপ ছারখার;
নতুন শপথে হবে ভয়মুক্ত প্রত্যয়ের স্বর,
নতুন তরঙ্গ-দোলা প্রাণে প্রাণে আনন্দ সঞ্চার।
সম্মুখে ছড়িয়ে দৃষ্টি দেখি বাঙলা কেমন সুন্দর!
সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর।

সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন,
আরম্ভ সেদিন থেকে জীবনের নব মহোৎসব;
আবার সকল চিন্তা আমাদের স্বার্থলেশহীন,
প্রীতির বন্যায় হাসি দেশময় হর্ষ-কলরব।
ভালোবাসা দিয়ে এসো এইবার শুধি ভ্রাতৃঋণ,
সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন।

এক সুরম্য প্রাসাদ থেকে

ভালোবাসার এক সুরম্য প্রাসাদের
সুউচ্চ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অনেক ওপরে
উঠে এসেছি। সেখান থেকে শোনা গেল
তাদের ব্যর্থ প্রয়াসের আকণ্ঠ বিলাপ
যারা মানুষকে ভালোবাসতে শেখে নি
এবং কখনো কাউকেই শেখায়ও নি।

ছলনার পাশা খেলায় ওরা পরাজিত
কুরুক্ষেত্রের শতভ্রাতা কৌরবের মতো।
ভালোবাসার সেই সুরম্য প্রাসাদের
সুউচ্চ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আরো ওপরে উঠে
দেখছি, ভালোবাসার ফুল ধরছে এখন
গাছে গাছে, পৃথিবীর আনন্দ-বাসরে।
নেভানো আলোগুলি আবার জ্বলে উঠছে,
ভালোবাসার স্বর্গে নূপুর ঝঙ্কৃত নৃত্য চলেছে
অপ্সরীদের; ঝড়ের পর এখন প্রশান্তি—
ভালোবাসার সেই সুরম্য প্রাসাদের
সুউচ্চ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ছাতে উঠে দেখছি,
দেশের পর দেশ মুক্তির মহোৎসবে এখন মত্ত।

শামুকেরা ঝিনুকেরা

শামুকেরা ঝিনুকেরা বোধহয় নিজের নিজের সঙ্গেই
সব সময় কথা বলে। বোধহয় তাতেই ওদের খুব আনন্দ।
আমার বেলাতেও তাই। আমিও নিজের সঙ্গে কথা বলে
যত আনন্দ পাই তেমন আর কারো সঙ্গে কথা বলেই
পাই না। অন্য সবার বেলাতেও বোধ হয় সেই একই কথা।
আসলে শামুকেরা ঝিনুকেরা এবং আমরা সকলেই যে
নিজের সত্তাকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসি এ তারই
প্রমাণ। গাছেরাও সব নিজের নিজের সঙ্গেই কথা বলে
মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, তাতেই তাদের সীমাহীন আনন্দ।
আসলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকেই বেশি ভালোবাসি,
তা' না হলে এত ভালোবাসার জন থাকতেও নিজের সুখের
কথা এত বেশি করে আমি ভাবি কেন? কেনই বা নিজের
আনন্দ-মৌচাকে মন-মৌমাছি বার বার এমন ঘুরে বেড়ায়?
আসলে আমরা প্রত্যেকে নিজেকেই বেশি ভালোবাসি—
যত শামুকেরা ঝিনুকেরা গাছেরা এবং আমি, আমরা সবাই।

খেয়া

ওই পারে উচুনিচু আলোর মিছিল,
চিন্তার কলরবে এপার মুখর;
গাছের মাথায় যত আঁধারের ঘুম,
কানে কানে কথা কয়ে বাতাস পালায়।
সবুজ ঘোমটা টেনে সব সয়ে যাওয়া,
কে আছে সহনশীলা মাটির মতন?
নক্ষত্রও ক্লান্তিহীন রাত জেগে জেগে।
ময়ূর পেখম মেলে হৃদয়ে হৃদয়ে,
কিন্তু তার কত আয়ু কতটুকু খেলা?
সুরে সুরে হাসি আর কান্নার ঝড়,
অতৃপ্তি নদীর বুকে ক্ষণে ক্ষণে ঢেউ;
মোট ফল জীবনের স্বাদ নোনা নোনা,
আশার আনন্দ সে তো সবই অনিশ্চয়;
খেয়াঘাট পারাপার তবু অহরহ।

একটি সুবর্ণ নামে

শান্ত নদীর ধারে
এক খণ্ড অন্ধকারের উপনিবেশ
গড়ে ওঠে আশ্চর্য চমকে।
বিশ্রামের সামান্য অবকাশে
একটি সুবর্ণ নাম সেখানে
মুহুর্মুহুঃ হাসির আলো ছড়িয়ে দেয়,
আর আমি সেই আলোর নেশায়
অন্ধ আবেগে চুর হয়ে থাকি।

কবিতার রামধনু তখন আকাশে,
শান্ত নদীর বুকেও তখন
কবিতারই মৃদু মন্থর তরঙ্গমালা।
আর সেই সুবর্ণ নাম সে সময়
মুহুর্মুহুঃ অনবদ্য নৃত্য ভঙ্গিমায়
কবিতারই ছন্দে ছন্দে
প্রেমের বন্দনা গেয়ে চলে।

নীরব নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায়ও
বিবেকানন্দ ব্রীজের কোলে
অজস্র হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ে,
আর সেই হাসির আলোর ঝর্ণায়
আমি প্রাণভরে স্নান করে উঠি।

পোষা বেড়াল বা কুকুরের মতো

সময় যেন এক পোষা বেড়াল,
ঠিক একটি পোষা বেড়ালের মতোই
আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত।
ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলবো সময়কে,
তার কোনো উপায়ই নেই। প্রকৃতির
আলো-হাওয়ায় অন্ধকারে দুর্যোগে
সময় আমায় সর্বক্ষণই একইভাবে
অনুসরণ করে চলেছে এবং চলবেও।
আগে আগে চলাই আমার অভ্যাস,
আর সময় তার রাগ-অনুরাগ এবং
নিন্দা-প্রশংসার ডালি নিয়ে এগোয়,
আমার পিছু নেয় এবং ছুটে চলে।
এখানেই আমার তৃপ্তি, আমার অহংকার,
কারণ আমি অনুসরণ করি না, কখনো না।
চিরকালই আমি অনুসৃত হয়ে আসছি—
সেই তো আমার গৌরব, আমার সান্ত্বনা!
সত্যি সত্যি ঠিক এক পোষা বেড়ালের মতো,
কিংবা পুরনো একটা পোষা কুকুরের মতো
সময় আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত
এবং সময়ের সেই আনুগত্য সম্পূর্ণ অকৃত্রিম!

চিন্তগুলি ঢেউ

চিন্তাগুলি সব যেন ঢেউ,
নদীর ঢেউ-এর মতো।
আমরা সবাই বুঝি নদী,
আমি তুমি আশপাশে
আরো লোক যতো।
সত্যিই তাই না হতেম যদি,
নদীর ঢেউ-এর মতো
আমাদের সকলের মনে
ক্ষণে ক্ষণে
রাশি রাশি ভাবনারা
করে কেন ওঠা-নামা
বলে দেবে কেউ?
চিন্তাগুলি সব যেন ঢেউ।

যাদুঘরে ইতিহাস

ঋতু বদলের পালায় এখন আর ছন্দের মিল নেই. ;
বর্ষার মাসেও তাই কুপিত নগ্ন সূর্যের তীব্র কষাঘাত
সহ্য করে যেতে হয় ; আবার এমনো ঘটে, বোশেখেও
আকাশের কান্নাই থামে না, প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় শীত।

ঋতু বদলের পালায় এখন আর ছন্দের মিল নেই ;
তাই বলে ভালোবাসাকে বিদায় দিয়ে দস্যুতা কায়েম,
সেও কি সম্ভব? রিক্ততায় সে স্পর্ধার আজ ভরাডুবি ;
এখন সেসব স্মৃতি যাদুঘরে, ইতিহাসের কয়টি পাতায়।

ঋতু বদলের পালায় এখন আর ছন্দের মিল নেই ;
তবুও রণক্লান্ত নিদ্রিত রাত প্রভাতের লাবণ্য প্রত্যাশী।
প্রকৃতিরই পীড়নে অস্থির, আর নয় উদ্যত আয়ুধ ;
মধুর মমতা আর ছন্দোময় স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসা চাই।

বাঁচতেই হবে

কতদিন আর তুমি বোবা হয়ে থাকবে
কতদিন আমিই বা বোবা হয়ে থাকবো
বোবা হয়ে থাকলেই আমি নিরাপদ তা নয়
বোবা হয়ে থাকলেই তুমি নিরাপদ তা নয়
একদিন তোমাকে জোর প্রতিবাদ করতেই হবে
একদিন আমাকেও জোর প্রতিবাদ করতে হবে
রুখে না দাঁড়ালে তুমি বিচূর্ণ হয়ে যাবেই
রুখে না দাঁড়ালে আমিও চূর্ণ হয়ে যাবোই

কতদিন আর তুমি বোবা হয়ে থাকবে
কতদিন আমিই বা বোবা হয়ে থাকবো
অন্যায়কে তুমি আর মোটেই বাড়তে দিও না
অন্যায়কে আমিও আর বাড়তে দেবো না
সেই প্রতিরোধই তোমার যেমন বাঁচার পথ
সেই প্রতিরোধ আমারও তেমনি বাঁচার পথ
বোবা হয়ে থাকলে তুমি-আমি বাঁচবোই না
বোবা হয়ে থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না
অথচ তোমাকে আমাকে এবং সকলকেই তো
সুন্দর জীবন নিয়ে আনন্দেই বাঁচতে হবে।

অস্থিরতার বন্দী

আলোড়নঃ অনাদি অনন্ত এক
আলোড়ন যেন সর্বক্ষণ
আমায় চারদিক থেকে ঘিরে আছে,
আমি তাই অস্থিরতার বন্দী।
আফ্রিকার যে কালো মানুষটিকে
আমি ভালোবাসি,
আমেরিকার যে কালো মেয়েটিকে
আমি ভালোবাসি,
আশপাশের শ্বেতাঙ্গদের প্রতি,
আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রতি
আজীবন তাদের কী অসীম ঘৃণা!
আঘাতে আঘাতে, মনুষ্যত্বের প্রতি
আঘাতের যন্ত্রণায় বিমূঢ় তারা,
আকণ্ঠ পূর্ণ তাদের ঘৃণার তীব্র বিষে।

আফ্রিকার সেই কালো মানুষটি,
আমেরিকার সেই নিগ্রো মেয়েটি,
আমি যাদের নিজের মতো ভালোবাসি
আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা
আর কিছু নয়, শুধু ন্যায় বিচার ও
আত্মার অবমাননা থেকে মুক্তি চায়।
আদৌ এ দাবী উড়িয়ে দেওয়া চলে না,
এ দাবী যে মানবতার দাবী।
আজকের যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে
আমরা যারা কালো পৃথিবীর মানুষ,
সবাই আমরা মানুষের মতোই

সসম্মানে বাঁচতে চাই।

অনাদি অনন্ত এক আলোড়ন
আমায় ঘিরে আছে,
আমি তাই অস্থিরতার বন্দী।
আফ্রিকার যে কালো মানুষটকে
আমি ভালোবাসি,
আমেরিকার যে কালো মেয়েটিকে
আমি ভালোবাসি,
আশপাশের শ্বেতাঙ্গদের প্রতি
আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রতি
আজীবন তাদের কী অসীম ঘৃণা!
আকাশের দিকে তাকিয়ে
আফ্রিকার সেই কালো মানুষটি
আমেরিকার সেই নিগ্রো মেয়েটি
আর কিছু নয়, শুধু ন্যায় বিচার ও
আত্মার অবমাননা থেকে মুক্তি চায়।
আদৌ এ দাবী উড়িয়ে দেওয়া চলে না,
এ দাবী যে মানবতার দাবী!
আমেরিকার ইয়োরোপের
আফ্রিকার অস্ট্রেলিয়ার
আপামর শ্বেতাঙ্গদের
আজ এ-কথা জানিয়ে দিতে হবে—
আমরা যারা কালো পৃথিবীর মানুষ,
আত্মার অবমাননা আর আমরা সইবো না,
আমরা কিছুতেই তা সইবো না।

অনাদি অনন্ত এই আলোড়নই যেন
আমায় একান্তভাবে ঘিরে আছে,
আমি সেই অস্থিরতারই বন্দী।

পুনর্বাসন

মোটেই সে নিষ্ঠুর নয়।
যেমনি সে স্নেহ-কোমল,
তেমনি অপরিসীম তার করুণা।
তাকে আমরা ভয় পাই অকারণে,
ভালো করে তাকে কোনোদিন
বোঝবার চেষ্টা করিনি বলে।
অথচ কেউ যাতে ভয় না পায়
তারই জন্যে নিঃশব্দ পায়ে তার
আসা। নিতান্তই ধীর মন্থর
তার গতি। অভয়ের বার্তা
নিয়েই সে আসে। শান্তির আশ্বাস
এবং আশীর্বাদ তার উপহার।

সেই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া।
শ্রেষ্ঠ বিচারকের সেই শ্রেষ্ঠ দান
সবারই শান্তভাবে গ্রহণীয়।
শেষ আশ্রয় তাঁর শীতল বুকে
সত্যই পরম শান্তির!
সকলকে সমানভাবে কে আর
এমন করে ভালোবাসে?
আর এমন ভালোবাসা কি আর কারো
পক্ষেই সম্ভব? তা ছাড়া আবহমানকাল
ধরে এমন অকুণ্ঠ অকৃপণতায়
এমনি দরাজ হাতে সমস্ত উদ্বাস্তুর
পুনর্বাসন ব্যবস্থা কার কাছেই বা
আশা করা যেতে পারে?

শব্দগুলি ইচ্ছেগুলি

বুকের ভেতরের শব্দগুলিকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে
বেলুনের মতো করে নিয়েছিলাম ;
মনের ভেতরের ইচ্ছেগুলিকেও তেমনি করেই
বেলুনের মতো করে নিয়েছিলাম।
নানা রঙের নানা সাইজের নানা ধরনের বেলুন,
বেশ লাগছিল সেগুলি দেখতে!
শুধু দেখতেই যে সেগুলি ভালো লাগছিল তা' নয়,
মনের ময়দানে তা নিয়ে খেলতেও।
কিন্তু খেলতে গিয়েই যত বিপদ, অনিবার্য বিপদ—
সব বেলুনেরই যে অনিশ্চয় স্থায়িত্ব!

বুকের ভেতরের শব্দগুলিকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে
বেলুনের মতো করে নিয়েছিলাম,
মনের ভেতরের ইচ্ছেগুলিকেও ফুলিয়ে ফুলিয়ে
বেলুনের মতো করে নিয়েছিলাম।
লাল-নীল সবুজ-সোনালী বেগনী রঙের সব ইচ্ছে,
নানা কল্পনার, নানা ধরনের রকমারি সব ইচ্ছে—
বেশ লাগছিল সেগুলি অনুভবে।
বেলুন নিয়ে ছুটতে দৌড়ুতে গেলেই হঠাৎ বিপর্যয়,
তা' থেকে রেহাই নেই, বেলুন ফাটবেই।
আমার মনের তোমার মনের এবং সকলের মনেরই
ইচ্ছেগুলির সেই একই রকম অবস্থা,
দৌড়ুতে গিয়ে ছুটতে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে
ইচ্ছের বেলুনগুলিও হঠাৎ হঠাৎ ফটাস্!

মাছেরা নদীকে

তুমি এলে পড়ন্ত বেলায়
আলো যখন ফিকে হয়ে আসছে আকাশে।
তুমি এলে অনেক দেরিতে
নিজেকে যখন সে ক্লান্ত পাখি বলে ভাবছে।
তুমি এলে যাবার সময়ে
যখন সে ফিরে চলেছে আপনার ঘরে।
তুমি এলে এত বিলম্বে
তবু সে থমকে দাঁড়ালো নূপুর নিক্কনে।
সাহারা হতে হতে হঠাৎ
যেন পৃথিবীটা আনন্দ-ভবন হয়ে উঠলো।
অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে
সে আবার সোজা হয়ে মঞ্চে ফিরে এলো।
সূর্য-কিরণের বন্যায়
নীরবে তলিয়ে গেল অন্ধকারের সিঁড়িগুলি।
সে আবার ভালোবাসতে লাগলো
যেমন করে মাছেরা নদীকে ভালোবাসে।

অহরহ শিলান্যাস

শিলাবৃষ্টিতে শীতল হয়ে বসে ভাবছিলাম,
বড্ড বেমানান ছিল ওদের অনধিকার অবস্থিতি ;
অপ্রেমের নিষ্ঠুর জবরদস্তির ঐ প্রতীকগুলিকে
তাই হটিয়ে দেওয়া সংগতই হয়েছে নিঃসন্দেহে।
তবু ময়দানের ঐ শূন্য বেদীগুলি বড়ই চোখে লাগে,
সেখানে আছড়ে পড়ে অবিরাম খাঁ খাঁ হাহাকার।
তবে এও জানা কথা সাময়িক এ অপূর্ণতা নিশ্চয়
পূর্ণ হয়ে উঠবে গভীর ভালোবাসার সংস্থানে ;
বেদীর দখল নেবে একে একে এসে প্রিয় যত
নতুন মূর্তিরা। চোখ ভরে উঠবে তখন আনন্দে।

শোকেসের বন্দিনী নারীরা যথার্থই অসহায়,
উৎসুক দৃষ্টির শরে সকলেরই বিক্ষত শরীর ;
তবু ওরা শোকেসেই সর্বক্ষণ নিরুদ্বেগে থাকে।
হৃদয়-উদ্যানের কথা অবশ্যই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ;
সেখানেও মাঝে মাঝে হাসিখুশি মূর্তি গড়ে ওঠে,
প্রবল প্রচণ্ড ঝড়ে ধূলিসাৎ কখনো কোনোটি ;
তা' হলেও অহরহ শিলান্যাস উৎসব কল্লোল
অন্তর প্লাবিত করে প্রকৃতির বিচিত্র লীলায়।
আমার অবাক লাগে সে খেয়ালী রহস্য সন্ধানে
খেই হারিয়ে ফেলি যখন, তখন আবার শিলাবৃষ্টি!

রূপ রস আর গন্ধ নিয়ে

রূপের ধূপে মাঝে মাঝেই
আগুন জ্বলে ওঠে
সেই আগুনে ঝলসে ওঠে চোখ ;
চতুর্দিকে সেই ধোঁয়ায়ই
নেশার ঢেউ ছোটে.
আনন্দময় সকল চিত্তলোক।

কখন আবার পালাই পালাই,
তৃষ্ণাকাতর কখনো চাই
ঐ ধূপের গন্ধটাই।
থাক না দূরে, অনেক দূরে—
গন্ধটুকু পেলেই হলো
রূপের রসের রঙের জগৎ থেকে ;
কালো মেঘের ছায়ার ভারে
মনের আকাশ বারে বারে
না যায় যেন ঢেকে,
হাসির রেখার আলোক যেন পাই।

আমার যখন রয় না কিছু চাওয়ার
কিংবা কিছু থাকে না আর পাওয়ার
আমি তখন এই পৃথিবীর হাটে মাঠে বাটে
নিজ খেয়ালে বেড়াই।
হঠাৎ হঠাৎ কোথাও কোথাও
হয় তো নেহাৎ অকারণেই
থমকে গিয়ে দাঁড়াই।

রূপ রস আর গন্ধ বিকোয় সবখানেই
সেই আগেরই মতো ;
খদ্দেরদের ভিড় কোথাও কোনো দিনই
কম দেখি না, সব মেলাতেই
আর্ত মানুষ যতো।
সেই সীমাহীন রসের জগৎ
যার তুলনা নাই ;
কিছু না হোক আজো মধুর
গন্ধটুকু পাই।
রূপের মেলায় বিশ্ব মাতাল
যেমনি অতীত, চলতিও ঠিক,
ভবিষ্যতও তাই।

ঈশ্বরের সঙ্গে

সে এক বিনিদ্র রজনীর গল্প ঃ

শারদীয়া পঞ্চমীর রাত, বলতে গেলে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জেগে কাটালাম।
ঈশ্বরের সঙ্গে গল্পে গল্পে রাত কেটে গেল ;
বৃদ্ধ ভদ্রলোক রসিয়ে রসিয়ে বানিয়ে বানিয়ে
বেশ গল্প বলতে পারেন কিন্তু!

আমি ঘুমিয়ে পড়তেই তিনি এলেন,
এসেই আমার খাটের পাশের চেয়ারটা টেনে
একটু এগিয়ে নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসলেন।
অনেক দূর থেকে এসেছেন, তাই খুবই পরিশ্রান্ত
সমস্ত পথটাই তিনি হেঁটে হেঁটে এসেছেন,
সে জন্যেই এতটা ক্লান্তি নেহাতই স্বাভাবিক।
এসেই জল চাইলেন ভদ্রলোক, ঠাণ্ডা জল!
তৃষ্ণা নিবারণের পর সুস্থির হয়ে বসলেন,
সবিনয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলাম।
উত্তর এলো, আমার নাম ঈশ্বর।

তাহলে আমি স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই
কাছাকাছি বসে আলাপ করছি!
কিঞ্চিৎ অহংকার বোধ স্বাভাবিকভাবেই।
আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললাম—
কোথা থেকে এসেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে
তিনি জানালেন, এসেছি খাস স্বর্গরাজ্য থেকে।

স্বর্গের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম,
আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে তিনিও একটু হাসলেন।
তারপরে আমার আরেক প্রশ্নোত্তরে বললেন,
স্বর্গ অর্থাৎ শুধু সুখ শান্তির এবং আনন্দের জগৎ—
আপনাদের পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরের
অনেক রহস্যঘেরা অজ্ঞাত পৃথিবী।

কিন্তু অত দূর থেকে এত রাতে এই পৃথিবীতে
আসার কারণ? আমার এ জিজ্ঞাসার উত্তরে
খুবই যেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন অতিথি ঈশ্বর—
কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হলো, বেশ একটু কর্কশও।
বিরক্তির সঙ্গেই তিনি বললেন, ক্ষমতার লোভে
মানুষ ক্রমশই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে চলেছে।
শেষ পর্যন্ত তারা আমার অধিকারকেও যে সম্পূর্ণ
গ্রাস করতে উঠে পড়ে লেগে যাবে তা' ভাবা যায় নি,
বলে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলেন স্বর্গের দেবতা।
আমি তাঁকে শান্ত হতে সবিশেষ অনুরোধ জানালাম,
এবং মানুষের অপরাধ কোথায় তা' জানতে চাইলাম।

ঈশ্বর বলতে লাগলেন, মাত্র দুটি কাজ নিয়েই
আমি চিরকাল নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি—
সে কাজ সৃষ্টির কাজ এবং ধ্বংসের, সে কাজ অর্থাৎ
জীবন এবং মৃত্যুর লীলা খেলার শ্বাশ্বত কাজ।
এ জন্যেই তো জগৎ সংসারে আমার পরিচয়
লীলাময় বলে, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন ঈশ্বর।
কিন্তু আমার লীলাময় নাম এতকাল পরে
সম্পূর্ণই মিথ্যে প্রমাণিত হতে চলেছে।

কেমন করে? একটু ভয়ে ভয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম,
আর তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই বলতে শুরু করলেন—
আমার সৃষ্টির কাজে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণের অধিকার
কায়েম করেছে। তাও আমি মেনে নিয়েছিলাম
এক রকম বিনা প্রতিবাদেই। কিন্তু এ কি রকম,
আমার ধ্বংসের কাজটাও মানুষ নিজেদের হাতেই
তুলে নিলে! ঈশ্বর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।
আমি বিশদ বিশ্লেষণ চাইলাম তাঁর ধোঁয়াটে
এবং অস্পষ্ট অভিযোগের।

ঈশ্বর এবার স্পষ্ট হলেন। স্পষ্ট করেই বললেন,
জন্ম এবং মৃত্যুর দায়িত্ব আজ আর পুরোপুরি
আমার হাতে নয়, সে ক্ষমতা মানুষ অনেকটাই
কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। একদিকে চলেছে
জন্ম নিয়ন্ত্রণ, আরেক দিকে নিজেরাই খুনোখুনি করে
মরছে মানুষ। এরপর কি নিয়ে আমার দিন কাটবে?
ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরে উষ্ণ উত্তেজনা, অনেকখানি
বিষণ্ণতাও। আমি আবার তাঁকে শান্ত হতে বললাম।
আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম—ঈশ্বর, আপনি
মহত্তম লীলাময় জীবন ও মৃত্যুর শিল্পকলায়,
এবং মানুষও লীলাময় তার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে।
আপনার ক্ষমতা কেড়ে নেবার স্পর্ধা নেই মানুষের,
মানুষকে ভয় বা ঈর্ষা করার কারণ নেই আপনার।

আমার এই কথার পরেই ঈশ্বর ধীরে ধীরে চলে গেলেন!
ঘুমও আমার তার পর মুহূর্তেই ভেঙে গেল।

মানস গঙ্গোত্রী

চোখ বুজলেই এখনো গুলীর নিষ্ঠুর আওয়াজগুলি কানে আসে,
সেই সব গুলীই কি এখন কুঁড়ি থেকে ক্রমশ ফুল হয়ে ফুটছে?
পশ্চাতে বিরাট এক ক্যানভাসে স্বদেশের ইতিহাস তেল রঙে আঁকা,
অতিকায় ঐ মানচিত্র মনের দেয়াল জুড়ে অনুক্ষণ রয়েছে টাঙানো।
স্থিরলক্ষ্য জয়যাত্রায় অবিস্মরণীয় ঐ আশ্চর্য পটভূমিকাতেই আমি
স্বাধীনতার রৌদ্র মহাসমুদ্রে বার কয়েক ডুব দিয়ে পরতৃপ্ত হলাম।
এইতো আমার মানস গঙ্গোত্রী যেখানে অবগাহনের সুযোগ পেয়ে
কালশিরে পড়া দেহটা বহুকাল পর আবার বেশ চাঙা হয়ে উঠলো।
'জবাকুসুম সঙ্কাশং' বন্দনা মন্ত্র পড়ে সম্মুখের আকাশের দিকে তাকিয়ে
হিরন্ময় সূর্য দেবতাকে লক্ষ্য করে করজোড়ে আমি প্রণাম জানালাম।

চোখ বুজলেই এখনো গুলীর নিষ্ঠুর আওয়াজগুলি কানে আসে,
মহানগরীর রাজপথে ট্রাফিকের লালবাতিগুলি মাঝে মাঝেই যদিও
বাধা হয় বটে কিন্তু তাতে স্থায়ীভাবে পথচলা কখনোই থামে না।
তেলরঙে আঁকা ইতিহাসের ঐ বিরাট মানচিত্রের দিকে তাকালেই
দেখা যাবে হাতকাটা পা-কাটা মুণ্ডহীন ফুটো ফুটো অসংখ্য শরীর
আর ভাঙা ভাঙা অগুনতি পাঁজর, যেই হাড়গুলি রক্ত মাংসের দৌলতে
উর্বরা ভূমিতে সগৌরবে মহীরুহ বৃক্ষরা দাঁড়িয়ে। সবুজের প্লাবন
সেখানে। সত্যি আমি দেখিনি কোথাও সবুজের এমনি উৎসব।
সমস্ত গাছের পাতা সবই যেন মূল্যবান প্রেমপত্র বলে মনে হয়,
ভারত রেখেছে খুলে সকলেরই জন্যে তার হৃদয়ের সুবর্নভাণ্ডার।
স্বাধীনতার রৌদ্রে ডোবানো শরীরটাকে নিয়ে চলতে আর আমার
মোটেই কোনো কষ্ট নেই, কষ্ট থাকবার কোনো কথাও আর নয়।
বরং আমাদের সবার সমস্ত শুভ আকাঙ্ক্ষারই কুসুমকলিগুলি
এবার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের জন্যে নিতান্তই উন্মুখ হয়ে উঠেছে,
যদিও চোখ বুজলেই এখনো গুলীর নিষ্ঠুর শব্দগুলি কানে আসে।

স্মৃতির প্রদীপ

আবহাওয়া যখন শান্ত ফুলেদের নিঃশ্বাসের ঘ্রাণে
তখনো মগজের সমস্ত চিন্তা সেদ্ধ হয় তালুর উনানে।
সূর্যাস্ত শোকের ছায়া ঘনীভূত যে সময় অস্তাচল জুড়ে,
দর্পণে নিজেকে দেখে ঠিক যেন বিদ্রূপের মতো মনে হয়।
আমার জানালা দিয়ে দিবারাত্রি সময়েরা আনাগোনা করে,
তাদের পায়ের ছন্দে ঘুম নামে নিরুত্তাপ পালংক শয্যায়।
নগরীর ধোয়াশায় মিশে গিয়ে অন্ধকার আরও বিকট,
মৃত্তিকায় প্রতিবিম্ব দুর্যোধন রাবণের কংসের মুখের।
দিগন্তে সংকেত জাগে, আত্মরক্ষা সেনানীর উজ্জ্বল নির্দেশে,
অকস্মাৎ অনর্গল ক্রুদ্ধশ্বাস নাগিণীর সহস্র ফণায়।
তপস্যায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই দেহ পৌরাণিক দধিচীর হাড়,
সব দম্ভ চূর্ণ হয়ে স্বর্গরাজ্যে সুবিশাল জমেছে পাহাড়!
উঁশ্রি কিংবা নায়াগ্রার একটানা প্রপাতের নিটোল গর্জনে,
কিংবা উগ্র কলরবে সঞ্জীবনী সমুদ্রের তরংগ লীলায়,
অথবা নিশীথে স্থিরদৃষ্টি নক্ষত্রের স্বর্গীয় সংগীতে
দেখি জন্ম-জন্মান্তের ইচ্ছাদের প্রতিচ্ছবি লব্ধ চেতনায়।
আমি মোক্ষে মোহহীন দূরাতীতে ঝটিকার মতো আবির্ভাব,
নিজের শ্মশানে জ্বেলে রেখে যাব অনির্বাণ স্মৃতির প্রদীপ।

বোসো, গাঁয়ের গল্প শুনি

আরে এই যে সুখাই মোড়ল!
কখন এলে, আছো কেমন?
তবু ভালো পড়লো মনে,
যাওনি ভুলে পুরোপুরি।
বছর তিনেক হবে বোধহয়
শেষ দেখা যে হয়েছিল ;
এসেছিলে করতে নালিশ
নেহাৎ-ই এক দায়ে পড়ে।
তাই না মোড়ল, সেই যে সেবার
যখন তোমার বিষম বিপদ,
আলের ছটাক জমি নিয়ে
চলছিল জোর লাঠালাঠি
মদন ভুঁইঞার লোকের সাথে।
আমিই গিয়ে বনগ্রামে
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

ভুঁইঞার লোকের কবল থেকে
ছাড়িয়ে এনে দিয়েছিলাম
তোমার জোড়া বলদ দুটি।
মিটিয়ে দিয়ে এসেছিলাম
অনেক কষ্টে ঝগড়াঝাটি।
দু' দল তখন হাসিখুশি,
কোলাকুলির বইছিল ঝড়,
মনে করতে পারছো মোড়ল?
থাকগে ওসব দূরের কথা,
এলেই যখন খানিক বোসো,
দেশের লোকের গল্প শুনি।

গগন সাধুর গানের আসর
তেমনি বসে সন্ধ্যে বেলা?
কালীতলায় আগের মতোই
বুড়োদের সেই আড্ডা বসে?
কালো টাকায় দুর্গা মন্দির
ব্যবসা জমাট, তাই না মোড়ল?
কে দেখবে কে বাধা দেবে—
গোটা দেশটাই কালোবাজার!
আর আর খবর কেমন বলো—
মনসুর মিঞা ভালো আছেন?
অমন মানুষ আর দেখিনা।
প্রায় তো শতেক বয়েস হলো।
দীর্ঘজীবন লোকের সেবায়
কাটিয়ে গেলেন নির্বিবাদে।
সব ধর্মেরই ছোট বড়ো
সবাই আপন সবাই সমান
যার কাছে, সেই খাঁটি ফকির
মহাজনকে সেলাম দিও।
আর কি খবর? বলো শুনি,
হামলা এবং মামলাবাজি

কমলো কিছু? নাকি যেই সেই
আগের মতোই নিত্য বিবাদ?
চোরের উৎপাত তেমনি আছে?
লুঠতরাজও অব্যাহত?
তাই কি মোড়ল? সত্যি বলো।
অনেক দিন তো যাইনি গাঁয়ে,
তবু কেবল এই আশাটুক
লুকিয়ে আছে মনের মাঝে,
সব কিছুই চলুক ভালো
আমার সোনার বনগ্রামে।

মোটামুটি ভালোই এখন,
শান্ত হাওয়া আগের চেয়ে ;
চলুন আবার কর্তাবাবু,
নিজের চোখে যাবেন দেখে!

বেশ তো, দেখি পারি কিনা
আরেকটিবার গাঁয়ে যেতে,
জমিদারী যাক গেছে যাক,
দুঃখ তাতে আর কিছু নেই ;
সকল কিছু ছেড়ে এলেও,
সুখের স্মৃতি ভুলে গেলেও
জন্মমাটি সদাই টানে।
সেসব কথা থাকুক এখন,
ক্লান্ত খুবই দেখছি তোমায়,
তামাক খাবে? লজ্জা কিসের?
সেকাল গেছে, আর মানা নেই।
এ আবার কে সঙ্গে তোমার?
একই আদল, ব্যাটা বুঝি!
চোখে মুখে অনেকটা মিল,
বাপের মতোই দেখতে বটে,
বেটেখাটো বেশ শক্ত মানুষ।

ওকেই সেবার দেখেছিলাম,
তাই না মোড়ল? ঠিক বলেছি?

কর্তাবাবু, যা বলেছেন—
ঠিকই আপনার মনে আছে।
ঐ তো আমার মূল ভরসা,
কেমন হবে তিনিই জানেন!
আর সবই তো কাঁচা কাঁচা।

বেশ তো খাসা জোয়ান ছেলে,
বুকের ছাতি এমনিই চাই,
আর পেশীবহুল অমনি বাহু!
যাক, থাকুক ওসব কথা এখন,
এলেই যখন খানিক বোসো,
গল্প করো গল্প শুনি ;
গাঁয়ের খবর কেমন বলো।
আগেই বলো আগের খবর—
ফসল এবার কেমন মাঠে?

ভালোই হবে করছি আশা।
তবে বাবু বলছি, শুনুন—
ধানের গোলায় যেমনি পুলিশ,
অমনি সবার মাথায় বাড়ি!

কিন্তু কেন এমন হবে?
দেশটা কিসে রক্ষা পাবে,
সেটাই তো ভাই প্রশ্ন আসল।
পুরো লেভি দিতেই হবে
দেশকে যদি বাঁচাতে চাও।
তবে কিনা চাষীর কথাও
ভাবতে হবে বিশেষভাবে।
ওদের ফসল নিতে হলে,
ন্যায্য মূল্য হবেই দিতে।

ওদেরও তো পুত্র-কন্যা-পত্নী আছে,
বাপ-মা আরো স্বজন আছে,
সবাইকে তো বাঁচানো চাই।
সমাজেরই মানুষ ওরাও,
দায়-দায়িত্ব সবই আছে ;
ট্যাকই যদি শূন্য থাকে
কী করে দায় সারবে তারা ?
বঞ্চনা তাই চলবে কেন ?
তাই না মোড়ল ? ঠিক বলেছি ?
চাষীরাই তো মাটির মনিব,
'জয় কিষাণ'—ঐ ধ্বনি তো তাই !

যা বলেছেন, সত্যি সবই,
তবে কিনা এখনো সব মুখে মুখেই ;
যা হোক তবু কিছু মানুষ
আছেন দেশে দুখীর কথা
যারা ভাবেন। চলি তবে কর্তাবাবু !

উঠছো কেন ? বোসো, বোসো—
গাঁয়ের আরো গল্প শুনি।
ক্লান্ত তোমায় দেখাচ্ছে খুব,
তামাক খাবে ? লজ্জা কিসের ?
সেকাল গেছে, আর মানা নেই।
এলেই যখন খানিক বোসো,
দেহটা তো বিশ্রামও চায় ;
গাঁয়ের খবর কেমন বলো।
ছেলে বোধহয় ইস্কুলে যায়,
উঁচু ক্লাসেই হয়তো পড়ে,
টেরি কাটে, জুলপি রাখে,
একটু বাবু, তাই না মোড়ল ?
তা' হোক তবু আমার মতে
লেখাপড়া শেখা ভালোই।

তবে কি ভাই একটি কথা—
চাষ ছাড়াটা ঠিক হবে না,
বুঝলে কিনা সুখাই ভায়া!
লক্ষ্মী সেথায় বাঁধা আছেন,
সব সময়েই মনে রেখো।

তাই তো বাবু আমিও বলি,
লাঙল গেলে থাকবে জমি?
লেখাপড়া যতই শেখো,
জমির দিকে নজর রেখো।

আচ্ছা মোড়ল, আরেক কথা—
কয়টি তোমার ছেলে মেয়ে?
কি বললে ভাই মিহি গলায়?
একটি মেয়ে ছয়টি ছেলে!
এ যে নিছক সর্বনাশা!
তোমার যেটুক জমি আছে
ভাগ হলে তার কে কি পাবে?
এমন বিপদ হাল আমলে
সখ করে কেউ ডেকে আনে?
তাইতো জবাব দিতে গিয়ে
বেশ কিছুটা লজ্জা পেলে!
থাকগে এখন ওসব কথা,
যা হবার তা' হয়েই গেছে।
কি কও সুখাই, কি আর করা?

যা বলেছেন কর্তামশাই,
এ সবই তো আমার কপাল!

যাক, ওসব এখন ভেবে কি লাভ?
আরো অনেক জানার আছে।
হ্যাঁ ভাই সুখাই বলছি শোনো—

তোমার শ্যামলা মেয়েটাকে
যাকে সেবার দেখেছিলাম,
সেবা যত্ন খুব করেছিল ;
ভাসা ভাসা চোখ দুটি আর
মুখখানি তার মন পড়ে।
এতদিন পর হলেও তবু
ছায়ার মতো সামনে ভাসে।
সেও তো এখন ডাগর হলো
ঊনিশ কুড়ি বয়েস হবে—
তাই না মোড়ল? ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, এক কুড়ি তো হবেই বটে,
ঠিকই আন্দাজ কর্তাবাবুর।
আবার কিনা বাড়তি গতর,
তাতে আরো বড়ো দেখায়।

তবে বে-থা দিয়ে ফেলো,
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।
জানোই তো সব সুখাই ভায়া,
কালের কি যে রকম সকম,
কী দরকার দায় ঘাড়ে রাখার?
তার চেয়ে ভাই মানে মানে
জামাই নিয়ে এসো বেছে,
দেখবে কতো আনন্দ তায়।

ভালোই বটে এই উপেদেশ,
তবে কর্তা পাত্র কোথায়?
ষণ্ডাগুণ্ডা জামাই হলে,
সেতো আরো দুখের হবে!
ভালো ছেলে জুটলে তবেই
আমার মেয়ের বিয়ে দেবো।
আচ্ছা বাবু, দুপুর হলো,
পেন্নাম হই চলি এবার।

উঠছো কেন? কিসের তাড়া?
এলেই যখন খানিক বোসো,
দেহটাতো বিশ্রামও চায়!
গাঁয়ের খবর খুলেই বলো,
কুশল তো সব? তবেই হলো।
ক্লান্ত তোমায় হচ্চে মনে,
তামাক খাবে? লজ্জা কিসের?
সে কাল অনেক আগেই গেছে;
ঐ যে হুঁকো খুশ মেজাজে
তৈরি হয়েই কাছে আসে!
